

সুলতানি ও মুঘল যুগের স্থাপত্য

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ,
ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর
কলেজ

সুলতানী আমলে ইন্দো ইসলামীয় স্থাপত্যরীতি

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য বলতে ভারতীয় উপমহাদেশের এমন স্থাপত্যকে বোঝায় যেগুলো ভারতের মুসলমান শাসকদের দ্বারা তাদের প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছে। সিকু সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান শাসকদের অধীনে গেলেও, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসনের ইতিহাস মূলত মুহাম্মাদ ঘুরির ১১৯৩ সালে দিল্লিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী বানানোর মাধ্যমে শুরু হয়। দিল্লির সুলতান ও মোগল সম্রাটরা মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তান হয়ে এসেছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে। তারা তাদের নির্মিত স্থাপত্যে ইসলামী স্থাপত্যের মধ্য এশীয় রীতি ব্যবহার করেছিলেন, যা ইরানি ইসলামী স্থাপত্যরীতি থেকে উদ্ভূত।

সুলতানি ও যুগে চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্য চরম উন্নতি লাভ করে। মূলত রাজানুকূলে সংস্কৃতির এইসব অঙ্গনে নবজাগরণ এসেছিল। একেত্রে সমন্বয়ধর্মীতা মূল বৈশিষ্ট্যরূপে ফুটে উঠেছিল। তাই এই যুগের চিত্র, স্থাপত্য ও সাহিত্যে কেবল মুসলিম।

দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধের (১১৯২ খ্রিঃ) পর মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি কুতবউদ্দিন-আইবক দিল্লি জয়কে (১১৯৬) স্মরণীয় করতে প্রথম মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে 'কোয়াত উল ইসলাম মসজিদটি' তৈরি করেন। অনেকে একে হিন্দু মন্দিরের উপর তৈরি বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক পার্শ্ব ব্রাউন বলেন, "মসজিদটি দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই"* কুতবউদ্দিনের জামাতা ইলতুতমিস ১২৫ ফুট উঁচু দিল্লির কুতবমিনারটি তৈরি করেন। ফিরোজ তুঘলকের সময় - কুতবমিনারে বাজ পড়ে এর অনেক ক্ষতি হয়। পণ্ডিত ফারগুসন বলেন, "কুতবমিনার পৃথিবীর সর্বোত্তম মিনার।

" স্যার জন মার্শালও কুতবমিনারের একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী ছিলেন। এছাড়া আজমিরের 'আড়াই-দিনকা কোপড়া', 'নাসির উদ্দিনের স্মৃতিসৌধ, মালকাপুরের 'সুলতান ঘারি' 'কুতব-অল-মসজিদ', বদাউনের 'হাউজ ইশামসি', 'সামনি ইদগা', 'জামি মসজিদ', রাজস্থানের যোধপুরের 'আর্কিনকাদরওয়াজা' অন্যতম স্থাপত্যকীর্তি বলবনের সময়ে কিল্লা-ই-রাওয় পিথোরার দক্ষিণ-

পূর্বে তাঁর স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। আলাউদ্দিনের আমলে তৈরি হয় ‘আলাইদরওয়াজা’, ‘সিরি নগরী’, ‘হাউসই-আলাই’, ‘জামাৎখানা মসজিদ’, ভরতপুরের বায়নার ‘উমা মসজিদ’ ইত্যাদি। দিল্লির কুতুবমিনার হল এয়োদশ শতকের মুসলিম স্থাপত্যের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির প্রতি প্রদ্বার্য নিবেদনের উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। কুতুবমিনারের নির্মাণ কার্য শুরু করেন কুতুবউদ্দিন আইবক এবং সম্পূর্ণ হয় ইলতুৎমিসের আমলে। খলজি আমলে বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ হয়। আলাউদ্দিনের জামাতখানা মসজিদ (নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় নির্মিত) ও আলাই দরওয়াজা হিন্দু শিল্পরীতির উপর মুসলিম শিল্পরীতির প্রাধান্যের প্রতীক। তুঘলকি শিল্পরীতির মধ্যে আমরা আগের আমলের বৈচিত্র্য সৌন্দর্য ও অলংকরণ দেখতে পাই না।

প্রাদেশিক স্থাপত্য- প্রাদেশিক স্থাপত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ভারতীয় ও ইসলামিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে প্রাদেশিক শিল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পশৈলী ও মসজিদ নির্মাণের মালমসলার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই কথাটি বিশেষভাবে বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে পাথরের বদলে ইটের ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল বলে মসজিদগুলি আকৃতিতে ছোট হত। তবে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সিকান্দার নির্মিত পাভুয়ার আদিনা মসজিদের বিশাল আকৃতি, সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। এখানকার অন্যান্য মসজিদের মধ্যে হুসেন শাহের আমলে ওয়ালি মহম্মদ নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ, নুসরত শাহ নির্মিত বড় সোনা মসজিদ ও তাঁরই আমলে নির্মিত কদম রসুল খুব বিখ্যাত। ১৪০০ থেকে ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জৌনপুরে যে শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল, তাতে হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট। এখানকার অটোলদেবী মসজিদ জৌনপুর শিল্পরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদে যে সব মসজিদ ও শিল্প নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে ভারতীয় শিল্পরীতির প্রাধান্য দেখা যায়। অবশ্য ইসলামের প্রয়োজনে ভারতীয় শিল্পরীতি কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্যরদবদল করা হয়েছিল। মাদুর মসজিদগুলিতে মুসলিম শিল্পরীতির প্রাধান্য দেখা যায়। এখানকার জাহাজ মহল, হিন্দোলা মহল ও জামি মসজিদ বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যে বাহমনি স্থাপত্য ভারতীয়, তুর্কি, মিশরীয় ও পারস্য শিল্পরীতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। গুলবর্গার জামি মসজিদ, দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার ও বিদরে মামুদ গাওয়ান নির্মিত মহাবিদ্যালয়ে পারস্য রীতির ছাপ স্পষ্ট। তবে এখানেও হিন্দু শিল্পরীতির প্রভাব এড়ানো যায়নি। তবে আদিল শাহি সুলতানদের নির্মিত মসজিদে দাক্ষিণাত্য শিল্পরীতির ছাপ প্রকাশ পেয়েছে।

দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগর রাজ্যে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের তৈরি বিটলনাথের মন্দির বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ সমালোচক ফার্ডিনান্ড এন উল্ফসিট প্রশংসা করেছেন। হিন্দু স্থাপত্যের অন্যান্য নিদর্শন হল রাজপুতানায় রাজা কুন্ডের ত্তল এবং ওড়িশায় পুরীর মন্দির ও কোনারকের সূর্য মন্দির।

মুঘল স্থাপত্যরীতি

বিশিষ্ট সমালোচক ফারগুসন (Fergusson) -এর মতে , মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্প পারসিক স্থাপত্যশৈলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মুঘল যুগে নির্মিত খাময়ুক্ত প্রাসাদ বা গম্বুজ প্রভৃতির সাথে পারসিক স্থাপত্যের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু হ্যাভেল (Havell) -এর মতে , মুঘল স্থাপত্যকর্মে হয়তো কিছু কিছু পারসিক স্থাপত্যকর্মের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাই বলে এক পারসিক ধারার পুনঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। তার মতে , মুঘল যুগে ভারতীয় শিল্পী ও স্থপতিগণ যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। তাই মুঘল-স্থাপত্যের উৎস ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য। আবার আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মুঘল-স্থাপত্যরীতিকে ভারতীয় ও পারসিক রীতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। কারণ মুঘল স্থাপত্যকর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নতুন কোনো সৃষ্টি নয়। সুলতানি যুগের স্থাপত্যশৈলী আরও পরিমার্জিত হয়ে মুঘল যুগে বিকশিত হয়েছিল। সম্রাটদের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে তা নতুন থেকে নতুনতর রূপে বিকশিত হয়েছিল। যেমন আকবরের রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় শিল্পে পারসিক প্রভাবের বাহুল্য ছিল , কিন্তু পরবর্তীকালে তা হ্রাস পেতে থাকে। জন্ মার্শালের মতে , এই বিশাল ভারতবর্ষে একটিমাত্র রীতি অনুসৃত হত — একথা ভাবা ঠিক নয়। কারণ আঞ্চলিক বিভিন্নতাহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের স্থাপত্যকর্মে বৈচিত্র্য থাকা ছিল অবশ্যস্বাভাবিক।

বাবর ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে খুব বেশি উৎসাহী ছিলেন না। তাই তিনি কনস্টান্টিনোপল থেকে শিল্পী এনে এদেশে প্রাসাদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তাঁর আমলে নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে পানিপথের কবুল-বাগ-মসজিদ এবং সম্বলের জামা মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

মুঘল-স্থাপত্যকর্মের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয় সম্রাট আকবরের সময় থেকে। অবশ্য আকবর ভারতীয় ও পারসিক রীতির সংমিশ্রণে স্থাপত্য-নির্মাণে বেশি উৎসাহী ছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আকবর নিজেই সৌধ বা প্রাসাদের পরিকল্পনা রচনা করতেন। সম্রাটের সমন্বয়ী আদর্শ তার স্থাপত্য-পরিকল্পনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাঁর আমলে উল্লেখযোগ্য সৌধ হল হমায়ুনের সমাধি। এর চার কোণে চারটি চূড়া ও মাঝখানে গম্বুজ ছিল। এটিতে পারসিক প্রভাবের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়।

আকবর নির্মিত প্রাসাদ ও দুর্গগুলিতে ইন্দো -পারসিক রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। আকবর নির্মিত প্রাসাদ ও সৌধগুলির মধ্যে ‘ ফতেপুর সিক্রি ’, ‘ যোখাবানি মহল ’, ‘ বুলন্দ দরওয়াজা ’, ‘ জামা মসজিদ ’, ‘ দেওয়ান ই খাস ’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফতেপুর সিক্রীর সৌধগুলি নির্মাণে গুজরাটি ও বাঙালি শিল্পরীতির সাথে পারসিক শিল্পরীতির অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। আকবর গুজরাট বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ফতেপুরে ‘ বুলন্দ দরওয়াজা ’ নামে ১৭৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ফটক নির্মাণ করেন। ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্যশৈলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লেনপুল বলেছেন , “ Nothing sadder or more beautiful exist in India than deserted city , the silent Witness of a vanished adream . ” ফতেপুরের স্থাপত্য সৌন্দর্যকে ফারগুসন বলেছেন , “ মহত্বপ্রাপ্তের প্রতিবিম্ব ’ এবং ভি. স্লিথ বলেছেন , পাথরে নির্মিত ‘ কল্পনা ও স্বপ্ন ’। সেকেন্দ্রাবাদে নির্মিত আকবরের সমাধি সৌধটির নির্মাণশৈলীর সাথে

বৌদ্ধ বিহারের সাদৃশ্য আছে। ফারগুসন এর সঙ্গে মহাবলীপুরমের রথমন্দিরের সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন।

ব্যক্তিগত ভাবে জাহাঙ্গীরের স্থাপত্য প্রীতি ছিল না। তবে সেই সময়ে নূরজাহানের উদ্যোগে আগ্রায় নির্মিত ইতমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধটি বিশেষ দর্শনীয়। এই সৌধের দেওয়ালগুলির 'বারাংখ' নীতি অনুসারে মূল্যবান শ্বেতপাথর দ্বারা আচ্ছাদিত করা ছিল। পারসি ব্রাউন-এর মতে, "Itmad-ud-daulati express in every part of it the high aesthetic ideals that prevailed among the Mughals at that time."

মুঘল স্থাপত্যকর্মের চরমতম বিকাশ ঘটেছিল শাহজাহানের আমলে। আগ্রা, দিল্লি, কাশ্মীর, লাহোর প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি অসংখ্য প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণ করেন। গঠন বৈশিষ্ট্য, কারুকার্য বা সামগ্রিক সৌন্দর্য — সব দিক থেকেই তার নির্মিত স্থাপত্যকর্মগুলি ছিল বিশিষ্ট ধরনের। শাহজাহান দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে দিল্লিকে সুসজ্জিত করে তোলেন। লাল পাথরে নির্মিত সুবিশাল লাল কেল্লা শাহজাহানের অন্যতম প্রধান সৃষ্টি। এ ছাড়া 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'জামা মসজিদ', 'মতি মসজিদ' এবং 'আগ্রার তাজমহল' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। দেওয়ান-ই-খাসের কারুকার্য, জামি মসজিদের অলংকরণ, দেওয়ান-ই-আমের গঠন পরিকল্পনা আজও দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করে। শিল্পদৃষ্টির বিচারে শাহজাহানের তাজমহল পৃথিবীর বিস্ময়রূপে চিহ্নিত। ফারগুসন-এর ভাষায় — "এর (তাজমহল) তুলনা পৃথিবীতে নেই এবং এটি এমন এক সৃষ্টি, যা শিল্প সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিকেও আকৃষ্ট করে। স্পেনীয় পর্যটক ফাদার ফার্নান্দেস এর মতে, "তাজের নকশা তৈরি করেছিলেন ভেরোনা নামক জনৈক ভেনেসীয় শিল্পী।" কিন্তু এ মতের সমর্থন মেলে না। ফরাসি পর্যটক থেভেনট - এর মতে, "তাজমহল হল ভারতীয়দের সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের প্রেষ্ঠ নিদর্শন। আব্দুল হামিদ লাহোরীর মতে, "তাজের গঠন পরিকল্পনা ও অভ্যন্তরীণ অলংকরণে প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্য বিদ্যমান। তার মতে, ১২ বছর ধরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সৌধ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্যদের মতে, প্রায় ২২ বছর ধরে কয়েক শত শিল্পীর পরিশ্রমে এবং ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের নিষ্পৃহতার ফলে তার সময় থেকে স্থাপত্যকর্মের অবনতি ঘটে থাকে। অবশ্য তিনিও কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, তবে সেগুলি ছিল খুবই সাদামাটা ও অলঙ্কারবিহীন।

মুঘল চিত্রকলা: সময়ের প্রতিফলন

মাংগলযুগের আগে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে চিত্রশিল্পের প্রচলন ছিল। বাবর চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হলেও তা ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির। প্রাকৃতিক দৃশ্য, যুদ্ধের কাহিনি বা রাজসভার বর্ণনার মধ্যে চিত্রশিল্পের স্থান ছিল। ভারতের প্রাদেশিক শাসকরাও নিজ নিজ উদ্যোগে মালব, জৌনপুর,